Vol. 51 | No. 1 | 2013

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রথম পার্থ : অস্তিত্বজিজ্ঞাসার মিথিক রূপায়ণ

Volume	51
Issue	1
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Tarana Nupur
Published online	October 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v51i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i1.3
Pages	৪৯-৭৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

প্রথম পার্থ: অস্তিত্বজিজ্ঞাসার মিথিক রূপায়ণ

Check for updates

তারানা নুপুর*

আধুনিক শিল্পীর নিকট মিথ তখনই আদৃত, যখন তা সমকালীন জীবনের সংকট, সংবেদনা ও অস্তিত্ব-ভাবনার প্রতিরূপক হতে সক্ষম। বিরূপ বিশ্বে কিংবা দেশ-কালের সংকটে আধুনিক মানুষ এক ধরনের 'নস্টালজিয়া' থেকে পুরাণের সন্নিকট হয় — মিথ-নির্ভর সাহিত্য নির্মাণে উৎসুক হয়। মূলত, অতীত ও বর্তমান, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে ক্রমশ ফিকে হয়ে যাওয়া সম্পর্কের মধ্যে সক্রিয় থাকে এক ধরনের আধুনিক 'নস্টালজিয়া'র সংবেদনা Modern Nostalgia, যা থেকে মানুষ ফিরে তাকায় তার পেছনে, শরণ নেয় মিথ কিংবা পুরাকাহিনীর। রোমন্থন-আক্রান্ত এই আধুনিক মানুষের ফিরে দেখার বিষয়টা অনেকটা বিছানায় শ্বাসরুদ্ধ ডেসডিমোনার প্রতি ওথেলোর ভালোবাসা ও সন্তাপের মতো, যে নিজেই তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ও সুন্দর সম্পদকে বিনষ্ট করে ভ্রান্ত সন্দেহের বশে। যান্ত্রিক বিশ্বে মৃতস্বপ্ন নগরীতে আধুনিক জটিল জীবনযাপনের ফলে বর্তমানের প্রতি মানুষের মধ্যে জন্ম নেয়া ঘৃণা এবং তারই শুশ্রূষার জন্য অতীতের প্রতি তৈরি হওয়া নস্টালজিয়া মূলত একই মুদ্রার দুটি ভিন্ন পিঠ। (Spender, 1965 : 209)[১] জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১) বিংশ শতাব্দীর প্রাণহীন বিশৃঙ্খল জীবনযাপন, ব্যক্তির সংকট ও একঘেয়ে পরিত্রাণহীন জীবন থেকে নস্টালজিক হয়েছেন প্রাচীন হোমারীয় যুগের প্রতি, যেখানে অন্তত ব্যক্তির সংকট ও সংগ্রামের সার্থকতা ছিল। এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাস্তবতায় পোড়োজমি, বন্ধ্যাত্ব আর অন্তঃসারশূন্যতা থেকে বৃষ্টি, উর্বরতা ও ফসল-সম্ভাবনায় মিথাবলম্বী হন তাঁর *The Waste Land* (১৯২২) কাব্যে। মূলত মিথের জগৎ এইসব আধুনিক মানুষের কাছে কাঙ্ক্ষিত, কারণ তারা শরণহীন। তাদের সামনে কোনো অলৌকিক শক্তি নেই, যার সাধনায় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় — তাদের সমস্ত প্রার্থনা, সকল সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় — অজস্র প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করেও অভীষ্ট মেলে না। এজন্যই এ কালের আধুনিক শিল্পীর নিকট মিথ এক পরমাশ্রয় — সমস্ত দুর্বোধ্য যন্ত্রণা ও অপ্রাপ্তি প্রতিস্থাপনের যথার্থ আধার। এলিয়ট বলেন, 'By losing tradition, we lose our hold on the present.' (Eliot, 2000 : 50) তাই বর্তমানের বিপন্নতা থেকে মুক্তি পেতে আধুনিক শিল্পী শরণাপন্ন হন মিথের। কারণ, 'ঐতিহ্য উত্তরাধিকারের সঙ্গে মানসলোকে সংযুক্ত থাকতে পারলে তবেই আধুনিক বিজ্ঞানবহুল যুগে যেখানে যৌথ জীবন ও সমাজ ভেঙে পড়ছে সেখানে বিচ্ছিন্নতা বা অ্যালিয়েনেশ্যেনকে এড়ানো যাবে। এটিই মিথোম্যানিয়া। সেই ঐতিহ্যের বাস্তবমূর্তি — আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যা হল ইতিহাস, এবং তার অন্তর্মুখী মানসপ্রতীতি মিলেই গড়ে তোলে ওই *মিথোম্যানিয়াকে*।'

---

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল।

(চন্দ্রমল্লী, ২০০১ : ২) ফলে আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতা উত্তরণের যথার্থ প্রতিরূপক হতে পারে মিথ।

২

আধুনিক বিশ্বে ব্যক্তির বিপন্নতা, বিচ্ছিন্নতা ও সংগ্রামের সংরক্ত শিল্প বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) *প্রথম পার্থ* (১৯৭০)। *প্রথম পার্থের* আখ্যান-উৎস *মহাভারতের* 'উদযোগ্ পর্ব'। কুরুক্ষেত্রে যখন অবিলম্বে সংঘটিতব্য মহাসমরের জন্য প্রস্তুত, যুদ্ধের আয়োজনে উদ্ব্যস্ত উভয় পক্ষ, আর যুদ্ধের প্রশ্নে শঙ্কিত ও দ্বিধান্বিত সমস্ত জনতা, তখন ভাগীরথীর তীরে নির্জন বনভূমিতে এক মহাবীর অথচ সর্বান্তকরণে নিঃসঙ্গ কর্ণের জীবনের নাটকীয় গ্রন্থিমোচন ও তার পরিণাম *প্রথম পার্থ* নাটকের উপজীব্য। মহাভারতের কর্ণ — বীরত্বে যিনি অর্জুনের সাথে তুলনীয়, দানে যিনি সূর্যের মতো উদার, ত্যাগে মহিমান্বিত; যার জীবন পুঞ্জ পুঞ্জ বঞ্চনায় পরিপূর্ণ; লোকাপবাদের ভয়ে জন্মক্ষণেই মা যাকে ভাসিয়ে দেন অশ্বনদীপ্রবাহে রাতের অন্ধকারে আর ক্ষত্রিয়জ হয়েও যিনি সমস্ত জীবনে বারংবার তার বর্ণপরিচয়ের জন্য দণ্ডিত; বীরত্বে-প্রেমে-প্রাপ্তিতে যিনি উপর্যুপরি উপেক্ষিত — প্রিয়জন এবং দেবতাদি দ্বারা সমভাবে; জীবনটাই যার কাছে এক যন্ত্রণাময় প্রহসন, সেই নিঃসঙ্গ, নির্লোভ, আত্মপ্রত্যয়ী, অনম্য কর্ণই বুদ্ধদেব বসুর *প্রথম পার্থ* নাটকের নামচরিত্র, কেন্দ্রীয় অবলম্বন।

মৃত্যুর মূল্যে মহত্ত্বের অধিকারী এই করুণ অথচ যশস্বী চরিত্র রবীন্দ্রনাথকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল *কর্ণকুন্তীসংবাদ* (১৩০৬) রচনায়। কর্ণের জীবনের সন্ধিক্ষণে কুন্তী কর্তৃক তার আত্মপরিচয় প্রকাশের মুহূর্তে পুত্র ও মাতার করুণ, ব্যথিত স্নেহবুভুক্ষা ও বাৎসল্য রবীন্দ্র-নাটকের উপজীব্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যে কর্ণ দ্বান্দ্বিক নয়, বরং রোমান্টিক আবেগে দ্রবীভূত; কুন্তীর প্রতি একটি মাত্র ব্যথিত অভিযোগ উচ্চকিত। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের লক্ষ্যও ছিল সে পর্যন্তই। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর *প্রথম পার্থের* কর্ণ সীমাহীন নৈঃসঙ্গ্য, চূড়াস্পর্শী অহম, অনমনীয় সততা, সংগ্রামশীল চৈতন্য ও আত্মক্ষয়ী পরিণতি নিয়ে হয়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীর দ্বন্দ্ব-জটিল আধুনিক মানুষের প্রতিনিধি; একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধদেব বসুর সমকালে কলোনি-শাসিত সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেকার যুবকদের সত্তার সংকট (identity crisis), তাদের অহমগত পরাভব, যোগ্যতা সত্ত্বেও অপ্রতিষ্ঠা, বঞ্চনা, যৌন-জীবনে অবদমন — এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য কর্ণ চরিত্রের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান। কর্ণ চরিত্র নির্মাণে বুদ্ধদেব বসুর স্বাতন্ত্র্য ও সার্থকতা এখানেই।

প্রথম পার্থ নাটকে কর্ণ উন্মূল এক চরিত্র; বৃক্ষপ্রতিম কোনো ব্যক্তিত্ব নয় — 'আমি চাইনা উদ্ভিদের মতো জীবন'। কর্ণ অহংপ্রবণ ও ভীষণভাবে আমিত্ব-চেতন; অদৃষ্টবাদী নয়, কর্মে আস্থাশীল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণ কুরু নয়, পাণ্ডব নয় — একক, নিঃসঙ্গ ও স্বাধীনচেতা। কর্ণের আত্মোপলব্ধিতে—

কর্ণ

আমিও তা-ই ভাবি মনে-মনে : আমি কে?
পাণ্ডব নই, কৌরব নই —
অনাত্মীয় এক আগন্তুক, কালস্রোতে ভাসমান এক পাত্র,
নির্বন্ধে ভরা, নিরুদ্দেশ, জল আর বাতাসের বেগে চালিত।
এক অনাহূত অতিথি আমি হস্তিনাপুরে,
কুলগোত্রহীন, নিষ্প্রয়োজন,
দৈবক্রমে কুরুবংশের কাহিনীর মধ্যে প্রবিষ্ট —
(বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১২০)

কর্ণের এই নৈঃসঙ্গ্যচেতনা, তার মানস-গঠন আকস্মিক নয়। সমস্ত জীবন ধরে বিবিধ বঞ্চনার লক্ষ্য সে। নির্জিত হয়ে হয়ে কর্ণ প্রথমে হয়েছে নিঃসহায়, তারপর নিঃসঙ্গ ও নির্জনতাপ্রিয়, ক্রমশ জীবন-বিবিক্ত ও আত্মচারী এবং এ সবকিছুর প্রতিকারে ক্ষমাহীনভাবে প্রতিশোধস্পৃহ। দিবাকর ঔরসে, কুন্তীর গর্ভে জন্মপ্রাপ্ত কর্ণ জন্মক্ষণেই পরিত্যক্ত হয়েছিল নদীজলে। কুমারী মাতা তাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল 'কালস্রোতে'। তারপর সারথি অধিরথের পুত্র ও রাধেয়রূপে পরিচিত কর্ণ বারবার বঞ্চিত হয়েছে তার হীনজন্মের জন্য। অস্ত্রশিক্ষার প্রদর্শনীতে সমস্ত অমাত্য, জনতা ও প্রতিযোগীদের সামনে দ্রোণাচার্যের উপহাসের লক্ষ্য ছিল সে। যেহেতু অর্জুনকে হতে হবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাই তার এই মূলোচ্ছেদ। ক্ষত্রিয়জ হয়েও মর্যাদাহীন জীবন, প্রতিস্পর্ধী চেতনার বিপরীতে এই অবমাননা, মহাবীর হয়েও স্বীকৃতিহীন সংকুচিত জীবনই কর্ণকে নিমজ্জিত করে শূন্যতায় — একই সাথে উদ্দীপ্ত করে জীবনপণ প্রতিশোধস্পৃহায়।

শুধু বীরত্বে নয়, জীবনের প্রতিটি সুবর্ণ মুহূর্তে কর্ণকে হতে হয়েছে নির্জিত, উপহসিত। প্রেমের ক্ষেত্রেও তাকে হতে হয়েছে ব্যর্থকাম। অযোগ্য নয়, শুধু অন্ত্যজ বলে স্বয়ংবর সভায় দ্রৌপদী প্রত্যাখ্যান করে কর্ণকে, কেননা অর্জুন ছিল তার বরণীয়। আবারো যজ্ঞভূমি থেকে বিতাড়িত কুকুরের মতো ফিরে আসে কর্ণ — অতৃপ্ত কামনা নিয়ে অভ্যস্ত হয় সূতনারীর সাথে সরল দাম্পত্যে। কিন্তু এই প্রতিকারহীন অবিচারে তার অবমানিত আত্মা, অবদমিত পৌরুষ, পরাহত যৌবন ব্যর্থ আক্রোশে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে করেছে দগ্ধ, বেদনাদীর্ণ, সংক্ষুব্ধ। কর্ণের যন্ত্রণাময় সংলাপে —

কর্ণ

(ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে, যেন আপন মনে)
দ্রুপদ কন্যা! —
যার চিন্তা আমাকে বহু রাত্রি বিনিদ্র রেখেছিলো,
দিনের পর দিন অশান্ত,
অপমানে দগ্ধ, প্রতিশোধস্পৃহায় অস্থির,
আর আকাঙ্ক্ষায় — আকাঙ্ক্ষায় উত্তাল :
নষ্ট আশা,
ব্যর্থ পরিতাপ,
দুর্মর স্মৃতি,

আমার অপহৃত নিষ্পাপ যৌবন—
ভাবিনি সেই তোমাকেই আবার চোখে দেখবো। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১২০)

সেই আরাধ্য অথচ অসাধ্য পাঞ্চালীকে দ্যুতসভায় দুঃশাসন কর্তৃক বিবস্ত্র ও নিগৃহীত হতে দেখে কর্ণ স্বভাবতই উপহাস করে পঞ্চপতির উদ্দেশে, যাদের দ্রৌপদী বরণ করেছিল অসৎভাবে, কর্ণকে উপেক্ষা করে — যাদের কর্মফলেই দ্রৌপদীর এ দুরবস্থা। কর্ণের কামনা, ক্রোধ ও দুঃখ তাই দুর্বিনীত উল্লাসে ওই একটিবারের মত মুক্তি পায়। পল্লব সেনগুপ্ত দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে কর্ণের এই উল্লাসকে তাঁর অবদমিত যৌন চেতনা চরিতার্থের প্রকাশ বলে উল্লেখ করেন— 'নিছক জন্মপরিচয়ের জন্য দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় কর্ণের অবমাননা ঘটা এবং ইন্দ্রপ্রস্থে ময়দানব-নির্মিত প্রাসাদে দুর্যোধনের বিভ্রান্তি দেখে তাকে কৃষ্ণসখীর বিদ্রূপ করা — এই দুটি কারণে ঐ দুই মহাবীর দ্রুপদতনয়ার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ছিলেনই। আবার তাঁর অসামান্য রূপলাবণ্যের মোহনীয়া আকর্ষণও তাঁদের নির্জিত করেছে চিরকাল। ... দ্রৌপদীকে নগ্ন করতে চাওয়া, কিংবা তাঁর উদ্দেশে অশ্লীল ইঙ্গিত করা অথবা তাঁকে পঞ্চপুরুষের নর্মসহচরী হবার জন্য 'বেশ্যা' বলে গালাগালি দেওয়া, কি চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে শ্লীলতাহানি করার মধ্যে দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসনের শুধু বৈরনির্যাতনের মনোভাব কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মানসিকতাই কাজ করেনি; তাঁর সম্পর্কে একটা চেপে রাখা লোলুপ দেহজ আকাঙ্ক্ষাও সমপরিমাণে ক্রিয়াশীল ছিল (চন্দ্রমল্লী, ২০০১ : ২০০-২০১)। পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর বিশ্লেষণে দুর্যোধন-দুঃশাসনের সাথে কর্ণ চরিত্রটির সাধারণীকরণ করেছেন। কিন্তু, দুর্যোধন-দুঃশাসন সম্পর্কে উক্ত অভিযোগ সত্য হলেও কর্ণ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, অন্তত বুদ্ধদেব বসুর কর্ণ ততটা স্থূল নয়। *প্রথম পার্থে* কর্ণের উল্লাস বিকৃত কামনার বহিঃপ্রকাশ নয়। বরং অন্যায়ভাবে বঞ্চিত কর্ণ তা করে প্রতিহিংসা চরিতার্থের আনন্দ থেকে — পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি ধিক্কারে, যারা দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষায় ব্যর্থ। *প্রথম পার্থ* নাটকে কর্ণ নারী-আসক্ত নয়। প্রথম বৃদ্ধের সংলাপে — 'মৃগয়া তার ব্যসন নয়, নারী তাঁর ছিল বিলাস নয়/প্রমোদে তিনি উদাসীন, নির্জনতা ভালোবাসেন।' (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ৭৮) অহমই এই কর্ণের প্রধান অবলম্বন। তাই, আত্মশ্লাঘা ও আত্মাভিমান ছাড়া কর্ণের আর কিছু নেই। ভীষণভাবে অপচয়িত তার সমস্ত জীবন। আর জীবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কর্ণ যখন তার সারাজীবনের বঞ্চনার পরিশোধে জিঘাংসু, তখনই তার সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করতে আসে কুন্তীর স্নেহের আহ্বান, রাজ্যের প্রলোভন, দ্রৌপদীর ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের আহ্বান, কৃষ্ণের সৌহার্দ্যের নিমন্ত্রণ।

কুন্তীর আহ্বানে তাই কর্ণ নির্মোহ, পাঞ্চালীর প্ররোচনায়ও সমভাবে উদাসীন। কারণ, কর্ণ দার্শনিক, তত্ত্বজ্ঞ। সে জানে পৃথিবী শুধু বনভূমি, পতঙ্গের গুঞ্জন আর পল্লবের মর্মর দিয়ে রচিত নয়; সেখানে আছে রাজধানী, প্রাসাদ, চক্রান্ত, সংঘর্ষ। ফলে, কর্ণের নিকট দৌপদীর বন্ধুত্বের আহ্বান বিফল, মৈত্রী প্রস্তাব তিরস্কৃত। কারণ, কর্ণ 'ভালোবাসার কাঙাল' নয়, 'আয়ুর ভিক্ষকু' নয়; নিঃসঙ্গ এক যোদ্ধা — আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্পে অনড় —

কর্ণ

মহত্তম সেই যুদ্ধ, যা নিঃস্বার্থ,
বিশুদ্ধ সেই চেষ্টা, যা নিষ্ফল।

আজ পাণ্ডবেরা জয়োৎসুক, কৌরবেরা জয়োৎসুক,
আকাঙ্ক্ষায়, আশঙ্কায় তাঁরা চঞ্চল —
পাঞ্চালী, তুমিও তা-ই।
শুধু আমি ইচ্ছাহীন, শঙ্কারহিত,
তুমি জেনো, আমি দুর্যোধনের যন্ত্র নই,
কেউ মিত্র নয় আমার, কাউকে আমি শত্রু বলে ভাবিনা—
আমি স্বাধীন, আমি নিঃসঙ্গ। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১২৯)

রাজত্বের অংশ, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবরূপে স্বীকৃতি, দ্রৌপদীর বাহুডোর, জয়-পরাজয় কিছুই কর্ণের কাঙ্ক্ষিত নয়; তার সংকল্প আমৃত্যু এক ব্যক্তিগত যুদ্ধ — 'আমার যুদ্ধ আমার নিজস্ব — আমার ব্যক্তিগত।' কারণ, এই যুদ্ধ তাকে দেবে আত্মপরিচয়। নিজের কাছে সে হতে পারবে প্রমাণিত, প্রকাশিত। কারণ, এতদিন ধরে যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগটুকু থেকেও বারবার বঞ্চিত হয়েছে মেধাবী কর্ণ। এ যুদ্ধ তার আত্মস্বীকৃতি অর্জনের মরণপণ পরীক্ষা — তার প্রতিভা প্রমাণের একমাত্র সুযোগ। কর্ণের সংকল্পে —

কর্ণ

এই যুদ্ধ
আমার বহুকালের প্রতীক্ষিত, প্রত্যাশিত।
সে অর্থ দেবে আমাকে, আমার অস্তিত্বকে।
আর বিনিময়ে
নেবে আমার চরম চেষ্টা, অন্তিম উদ্যম,
আমার সব অব্যবহৃত আবেগ। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১৪৩)

তাই কৃষ্ণের কল্যাণ-প্রস্তাব, সন্ধির অনুরোধেও কর্ণপাত করে না কর্ণ। এমনকি কৃষ্ণের মুখে নিজের সংঘটিতব্য পরিণতির কথা জানার পরও নয়। বরং, কৃষ্ণের বিকল্প প্রস্তাবে সম্মত হয় কর্ণ। অক্ষয় বটরূপী মহকালের বৃন্তে ফলে ওঠা মৃত্যু নিয়ে কর্ণ হতে চায় কিংবদন্তি — মহাকালের ইতিহাসে অনপনেয় এক নাম। মৃত্যুর মূল্যে সেই মহত্তর প্রতিষ্ঠা কর্ণের অভীষ্ট, যার ফলে এক মৃত্যুহীন অস্তিত্বরূপে সর্বযুগের মানুষের মনে সে অমরত্বে আসীন হতে পারে — এক 'ভাস্বর মহান পরাজিত বীর'রূপে —

কর্ণ

জানি, আমিও জানি,
সব এক অলঙ্ঘ্য সূত্রে গাঁথা হ'য়ে আছে।
আছে এক অদৃশ্য অক্ষয় মহাবট,
যার ডালে ডালে পক্ক হ'য়ে ফলে ওঠে
অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যে একটিমাত্র ঘটনা,
অসংখ্য কার্যকারণের একটিমাত্র পরিণাম,
অসংখ্য জিজ্ঞাসার পরে একটিমাত্র উত্তর।
সেই মহাবৃক্ষের কোনো-একটি শাখায় এবার দুলবে
রক্তিম একটি ফলের মতো আমার মৃত্যু। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১৫৪)

কালের ঘূর্ণনে লুপ্ত হবে ঘটনারাশি, জীবন-কর্ম-স্মৃতি সমস্তই — বিস্মৃত হবে অতীত। তারই মধ্যে বেঁচে রবে কর্ণের মৃত্যুর মহত্ত্বগাথা। অর্জুনের হাতে কর্ণের পরাভব তাই অসম্ভব। কালের মূল্যে বিস্মৃতিহীন অমরত্ব নিয়ে বিজয়ী থাকবে কর্ণই। মহাকালের পটে ব্যক্তির অস্তিত্বের সংকট, জিজ্ঞাসা ও পরিণামের আধুনিক রূপায়ণ বুদ্ধদেব বসুর *প্রথম পার্থ*। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এ নাটকেও বুদ্ধদেব বসু ব্যক্তি-অস্তিত্বের সঙ্গে সামষ্টিক-অস্তিত্বের সূত্রটি শেষ পর্যন্ত যুক্ত করেছেন দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপের মধ্য দিয়ে —

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কেউ কেউ কামনা করেন মহত্ত্ব — মৃত্যুর মূল্যেও।
মানি তাঁরা শ্রদ্ধেয়। কিন্তু আমি তাঁদের ভয় করি।
আমি বলি, তারাই ধন্য, যারা সাধারণ,
যাদের চরম লক্ষ্য সহজ সুখ, সাংসারিক তৃপ্তি —
তাদেরই জন্য মানব-বংশ আবহমান। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১৫৬)

অধিকাংশ নাটকেই বুদ্ধদেব বসু এমনিভাবে ব্যক্তির অস্তিত্বকে অঙ্গীকার করেও সামষ্টিক জীবনের সাথে যোগসূত্র অক্ষুণ্ন রাখেন। কারণ, ব্যক্তি নিয়েই সমষ্টি এবং সমষ্টি ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব অর্থহীন আর এই দুই মিলে তৈরি হয় সমগ্রতার চেতনা। বুদ্ধদেব বসুর মিথিক দর্শনের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে আধুনিক জীবনের প্রতি আগ্রহী হয়েও জীবন-প্রবাহের আবহমানতায় তিনি শ্রদ্ধাবান।

মিথ নির্মাণের ক্ষেত্রে আধুনিক সাহিত্যিকদের সাথে বুদ্ধদেব বসুর সূক্ষ্ম পার্থক্য এখানে যে, তাঁরা সমকালীনতাকে মুখ্য বিবেচনায় রেখে পুরাণের প্রচ্ছদমাত্র গ্রহণ করেন। আর বুদ্ধদেব পুরাণ থেকে অর্জন করেন বাস্তব জ্ঞান এবং সমকালের সাথে তাকে যুক্ত করে একটি বৃহৎ জীবন-চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মিথিক দর্শন আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী নয়, বরং একটি ধারাবাহিক বিবর্তনশীল সত্তায় আস্থাবান — জীবনের একটি পুরাবৃত্ত সৃষ্টিতে আগ্রহী। পুরাণ কাহিনীকে তিনি নিছক গল্পকাহিনী ভাবেননি। আধুনিক জীবন অপেক্ষা তাকে কম মর্যাদা দেননি। বুদ্ধদেব বসুর মতে — 'আমাদের আধুনিক বুদ্ধিতে যেসব ব্যাপার অবিশ্বাস্য (কিন্তু সবচেয়ে বুদ্ধিমানেরাও পুরাকালে যা বিশ্বাস করতেন) আমি সেগুলোকে অবাস্তব বলে প্রত্যাখ্যান করিনি, বরং সেই বাস্তবাতীত রহস্যের মধ্যেই মর্মকথার সন্ধান করেছি।' (বুদ্ধদেব, ১৩৯৭ : ৭-৮) আধুনিক জীবনকে স্বীকার করে নিয়েই প্রবহমান জীবন-অস্তিত্বকে আবিষ্কার বুদ্ধদেব বসুর মিথ-চেতনার মৌল উদ্দেশ্য। অন্যান্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর দর্শন যতই উন্মূল বা অনিকেত হোক না কেন, কাব্যনাটকের মিথিক দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি মূলাশ্রয়ী অস্তিত্বে বিশ্বাসী, চিরন্তন মূল্যবোধে দীক্ষিত; সুস্থির, প্রজ্ঞাবান এক শিল্পী। তাই পুরাণের কর্ণ এবং বিংশ শতাব্দীর কর্ণ — উভয়ের জীবনের সংগ্রাম ও পরিণতি মহাকালের অমোঘ নিয়মে সূত্রবদ্ধ।

৩

প্রথম পার্থ নাটকের আখ্যান-উৎস *মহাভারতের* 'উদ্‌যোগপর্ব', সময় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বদিন, স্থান গঙ্গাতীরের এক বনভূমি। *মহাভারতের* ঘটনাপ্রধান এই আখ্যানকে বুদ্ধদেব

বসু আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব-মানসতার সঞ্চারে একটি চরিত্রপ্রধান সংলাপধর্মী কাব্যনাটকরূপে পুনর্নির্মাণ করেন। মিথ-নির্ভর তাঁর অন্যান্য নাটকে *মহাভারতের* একেকটি সংক্ষিপ্ত ঘটনাংশকে রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু যেখানে কল্পনাশ্রয়ী, সেখানে *প্রথম পার্থে মহাভারতের* একটি বিস্তৃত আখ্যানকে অনুপুঙ্খ রূপ দানে তিনি সংশ্লেষণ-প্রবণ। *মহাভারতের* 'উদ্‌যোগপর্বের' একশ আটত্রিশতম অধ্যায় থেকে একশ চুয়াল্লিশতম অধ্যায় পর্যন্ত কাহিনী *প্রথম পার্থ* নাটকের পৌরাণিক উৎস-সীমা। এর মধ্যে বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকের প্রয়োজনে সংগ্রহ করেন একশ আটত্রিশ, একশ উনচল্লিশ ও একশ চল্লিশ অধ্যায়ে কৃষ্ণ ও কর্ণের কথোপকথন অংশ এবং একশ তেতাল্লিশ ও একশ চুয়াল্লিশ অধ্যায়ে কর্ণ ও কুন্তীর কথোপকথন অংশ। বুদ্ধদেব বসু পরিহার করেছেন এই দুই ঘটনাংশের মধ্যবর্তী অধ্যায়গুলো এবং একশ চুয়াল্লিশ অধ্যায়ে কর্ণের প্রতি সূর্যের অনুরোধের অংশটি। তৎপরিবর্তে বুদ্ধদেব বসু সংযোজন করেন দ্রৌপদীর সাথে কর্ণের কথোপকথনের একটি দৃশ্য, *মহাভারতে* যার অস্তিত্ব নেই এবং এ নাটকে দুই বৃদ্ধের সংলাপ ও তাদের উপস্থিতিও বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক নতুনভাবে সংযোজিত। লক্ষণীয় যে, বুদ্ধদেব বসু *মহাভারতের* এই অংশের ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতাকেও নাটকের প্রয়োজনে লঙ্ঘন করেন। *মহাভারতে* কর্ণের সঙ্গে কুন্তীর পূর্বেই কৃষ্ণের কথোপকথন ঘটে এবং কৃষ্ণ কর্তৃকই কর্ণ প্রথম অবহিত হয় তার প্রকৃত জন্মবৃত্তান্ত। সর্বোপরি *মহাভারতের* আখ্যানের উদ্দেশ্য যেখানে যুদ্ধ নিবারণ, সেখানে *প্রথম পার্থে* বুদ্ধদেব বসুর উদ্দেশ্য কর্ণের আমিত্ববোধ, আত্মোপলব্ধি এবং স্ববশ সংকল্প-চালিত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নে তার চরিত্রের দৃঢ়তা প্রমাণ। *মহাভারতে* যা কর্ণের আত্মশ্লাঘা ও অধিকার ত্যাগের মহত্ত্বরূপে বিবেচিত, এ নাটকে তা আধুনিক মানুষের সংকট ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামরূপে চিহ্নিত।

প্রথম পার্থ নাটকে দৃশ্যসংখ্যা তিন, যদিও নাট্যকার দৃশ্য বিভাজন করেননি এবং এই তিনটি দৃশ্যকে সংগ্রথিত করার ক্ষেত্রে নাটকের পূর্বাপর বজায় রাখতে তিনি ব্যবহার করেন হস্তিনাপুরের দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথোপকথন। দ্বিরালাপ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত নাটকটির প্রথম দৃশ্য কর্ণ ও কুন্তী, দ্বিতীয় দৃশ্য কর্ণ ও দ্রৌপদী এবং তৃতীয় দৃশ্য কৃষ্ণ ও কর্ণের কথোপকথনের সূত্রে পরিকল্পিত। সমস্ত নাটকে সূত্রধারের ভূমিকা পালন করে ওই বৃদ্ধ চরিত্রদ্বয়।

বুদ্ধদেব বসুর অপর নাটক *কালসন্ধ্যার* (১৯৬৯) দৃশ্যপট যেমন উন্মোচিত হয় '*পূর্বকথনে*'র দুই যাদব বৃদ্ধের কথোপকথনসূত্রে, তেমনি *প্রথম পার্থ* নাটকও আরম্ভ হয় হস্তি-নাপুরের দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সংলাপের মাধ্যমে। *কালসন্ধ্যা*-য় দ্বারকাপুরী ধ্বংসের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় দুই বৃদ্ধের সংলাপ ছিল যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি *প্রথম পার্থ* নাটকের শুরুতে আসন্ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রসঙ্গ, তা নিয়ে জনগণের মনস্তাত্ত্বিক উদ্বেগ, পূর্ব ইতিহাসের স্মৃতিচারণ, কর্ণ-প্রসঙ্গ উল্লেখ, নাটকীয় পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণে এবং নাটকের আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বয়ের প্রয়োজনে এই বৃদ্ধদ্বয়ের সংলাপ অত্যন্ত জরুরি। *কালসন্ধ্যায়* যাদব বৃদ্ধদ্বয় ঘটনার ভিত্তি তৈরি করে দিয়ে মঞ্চ থেকে তিরোহিত হয়, পুনর্বার নাটকে তাদের দেখা যায় না। তাদের সংলাপ শেষ হলে ঘটনায় সূত্রধারের ভূমিকা পালন করে নাটকের অন্য দুটি চরিত্র — সত্যভামা ও সুভদ্রা। কিন্তু, *প্রথম পার্থ* নাটকের ব্রাহ্মণ বৃদ্ধদ্বয় নাটকের প্রথম

থেকে শেষ পর্যন্ত মঞ্চে অবস্থান করেন, কখনো আলোকিত অংশে, অধিকাংশ সময় অনালোকিত অংশে। নাটকের কোনো কোনো চরিত্রের সঙ্গে তাদের সংলাপ বিনিময় হয়, কখনো কখনো চরিত্রগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতাও করে তারা এবং প্রতি দৃশ্যান্তে তারা পরস্পর মন্তব্যে রত থাকে। ফলে, নাটকে দৃশ্য বিভাজনের প্রয়োজন হয় না, দৃশ্যান্তর অনুভূত হয়। তবে, তারা দূর থেকে ঘটনা প্রত্যক্ষ অথবা শ্রবণ করে, মন্তব্য করে, কিন্তু নাটকীয় সংঘটনে অংশগ্রহণ করে না। সাধারণ দর্শকের মতোই কর্ণের জীবনের নাটকীয় ঘটনার তারা সাক্ষী, তারা জনগণেরও প্রতিনিধি। *প্রথম পার্থ* নাটকে বৃদ্ধদ্বয়ের সংলাপের এই বৈশিষ্ট্যটিতে গ্রিক নাটকের 'কোরাসের' প্রচ্ছায়া লক্ষ করেন সমালোচকদের কেউ কেউ — '*কালসন্ধ্যার* মতো *প্রথম পার্থ*-ও শুরু করেছেন দুই বৃদ্ধ, তবে তাঁদের বাচন ঈষৎ ভিন্ন তালের। ... তাঁরা চলে যাবেন না, থাকবেন শেষ পর্যন্ত, কেবল অন্যদের কথার সময় প্রচ্ছন্ন হবেন। যেমন নাটক শুরু করেছেন, তেমনি শেষও করবেন তাঁরা। আদলটা অনেকটা গ্রিক ট্রাজেডির।' (অমিয়, ২০০৮ : ৩৯৭) তবে, এ ক্ষেত্রে কমলেশ চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণটিই অধিক গ্রহণযোগ্য - — 'মহাভারত-কাহিনী অবলম্বিত বুদ্ধদেবের কাব্যনাটকের একটি পরম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে গ্রিক ট্র্যাজেডির মহান নাট্যকারদের মতো ঘটনাগুলি যে আগেই ঘটে গেছে — তিনি পাঠকদের কাছে তা গোপন করার চেষ্টা করেন না — অথচ নাট্যদর্শকদের মনে তিনি এই সম্মোহনের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন যে ঘটনাগুলি পুরাকালের পরিবর্তে যেন এইমাত্র দর্শকদের চোখের সামনেই ঘটছে।' (কমলেশ, ১৯৯৯ : ১২০) ঘটনাকে প্রত্যক্ষতা দেবার এই কৌশল *প্রথম পার্থ* নাটকে লক্ষ করা যায় প্রথম বৃদ্ধের মুখে কর্ণের জন্ম সম্পর্কে জনশ্রুতির উল্লেখে ও সে-সম্পর্কে মন্তব্যে :

প্রথম বৃদ্ধ

পাণ্ডব নন, কৌরব নন। তাঁর নাম কর্ণ।
সারথি অধিরথের পুত্র। আশ্চর্য, ঐ বিরাট পুরুষ, দীর্ঘকায়, দীর্ঘবাহু,
রূপে গুণে, আচরণে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ : তিনি সূতপুত্র?
তাঁর জন্ম নিয়ে নানা লোকে নানা কথা বলে,
তিনি নাকি পালিত পুত্র অধিরথের, তাঁর প্রকৃত পিতা এক
রাজরাজেশ্বর।
আমি কর্ণপাত করিনা ও-সবে। দেবতার দয়া হ'লে
কেন জন্ম নেবে না দীনের কুটিরে বীরত্ব,
যশস্বীর উৎস হবে না অখ্যাত বীজ?
যাকে বলে প্রতিভা, তা সহজাত। আমি এই বুঝি। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ৭৭)

লক্ষণীয়, উপর্যুক্ত সংলাপে কর্ণ চরিত্রের সাধারণ পরিচয় উল্লেখিত, যা নাটকের ভিত্তি নির্মাণে প্রয়োজন। একই সাথে অনতিকাল পরে ঘটিতব্য বাস্তবতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়, আবার কী ঘটতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কেও অনিশ্চয়তায় এক ধরনের নাটকীয় কৌতূহল সৃষ্টি হয়, সেই সাথে জনশ্রুতির উল্লেখে এবং তাতে বৃদ্ধের অনাস্থার মধ্য দিয়ে সাধারণ জনতার দৃষ্টিভঙ্গিটিও প্রতিফলিত হয়। এই কারণেই নাটকে কর্ণের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে কুন্তীর উৎকণ্ঠা, ব্রাহ্মণদের প্রতি গোপনীয়তা রক্ষার অনুরোধ এবং মাতৃ-পরিচয় জেনে কর্ণের সংবেদনা এত বেশি নাটকীয় ও বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে। ফলে বুদ্ধদেব বসুর

আধুনিক নাটকে নাটকীয়তা রক্ষায় গ্রিক নাটকের বৈশিষ্ট্যের এই প্রয়োগ যথার্থ কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

প্রথম পার্থ নাটকের প্রথম দৃশ্যটি কর্ণের সাথে কুন্তীর দ্বিরালাপে নির্মিত। *মহাভারতে* কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত পূর্বেই প্রকাশিত হওয়ায় কুন্তীর মুখে কর্ণের প্রকৃত জন্ম-ইতিহাসের বর্ণনায় তেমন নাটকীয়তার আস্বাদ পাওয়া যায় না। তাছাড়া সেখানে কুন্তীর মুখে তার কানীন পুত্রের জন্মবৃত্তান্ত নিতান্ত যান্ত্রিক, উদ্দেশ্যচালিত — 'কুন্তী কহিলেন, বৎস! তুমি কুন্তীনন্দন, রাধাগর্ভ-সম্ভূত নও; অধিরথও তোমার পিতা নন, সূতকুলে তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি আমার কানীন পুত্র; আমি কন্যাবস্থায় সর্ব্বাগ্রে কুন্তি-রাজভবনে তোমাকে প্রসব করিয়াছি; ভুবন প্রকাশক ভগবান্ দিনকর আমার গর্ভে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছেন। তুমি সহজাত কবচকুণ্ডলধারী দেবপুত্রসদৃশ ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে বৎস! তুমি আমার পিতার গৃহে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ-পূর্বক মোহবশতঃ স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সৌহার্দ্দ না করিয়া এক্ষণে যে দুর্য্যোধনের সেবা করিতেছ, ইহা কি তোমার সমুচিত কার্য্য।' (কালীপ্রসন্ন, ১৪১৩ : ৯৫৮) *প্রথম পার্থ* নাটকে কর্ণ ও কুন্তী দুজনেই আধুনিক জগতের বাসিন্দা। এখানে কুন্তী সরলভাবে তার লুকায়িত সত্যকে প্রকাশ করে না — আটঘাট বেঁধে, কর্ণের মানসিকতাকে প্রস্তুত করে নিয়ে তবেই তার গুপ্ত কথা প্রকাশ করে — কারণ, কর্ণের ছায়ার নিচেই তাকে খুঁজে নিতে হবে আশ্রয় — কর্ণের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে তার মাতৃ-অস্তিত্বের ভবিতব্য, এবং রাজনৈতিক জয়পরাজয়। তাই, সে সচেতন, সন্তর্পণে জাগিয়ে তুলতে চায় কর্ণের সংবেদনা — কারণ, আধুনিক বিশ্বে বিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক মানুষের হৃদয়গত টানাপড়েন সহজ নয়, জটিল ও দ্বান্দ্বিক — এ কথা জেনেই দুরধিগম্য কর্ণকে জয়ের লক্ষ্যে কুন্তীর সংলাপ হয়ে ওঠে কুশলী —

কুন্তী

তোমার সঙ্গে অচিরে তার দেখা হবে, কর্ণ,
দেখবে কেমনে অবিকল সে প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার:
তোমারই মতো দীর্ঘকায়, আয়তাক্ষ,
তোমারই মতো শক্তিমান, হৃদয়বান,
মহত্তম বন্ধু, শত্রুর পক্ষে অসহন —
ভারতবংশের সেই প্রথম পার্থ, যার নাম —
(হঠাৎ থেমে, উচ্ছ্বসিত স্বরে)
কর্ণ, পুত্র আমার। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ৮৫)

কিন্তু, কর্ণ অনম্য। কুন্তীর মুখে জন্মপরিচয় শুনে শুধু এক মুহূর্তের জন্য জেগে ওঠে কর্ণের বুভুক্ষু হৃদয়ের আবেগ— 'মা! আমার মা!/আমার ঘুমের মধ্যে লুকানো এক স্বপ্ন, আমার স্বপ্নের মধ্যে গোপন এক সঞ্চার–/আজ মূর্ত আমার চোখের সামনে!' কিন্তু, পরক্ষণেই কর্ণ সংবরণ করে তার আবেগ, হয়ে ওঠে তীক্ষ্ণভাবে আত্মসচেতন। কুন্তীর আবেগ, প্রলোভন, কৌশল সব যেন কর্ণের ধাতব-কঠিন অহম ও অস্মিতার দেয়ালে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে একে একে ফিরে যায় ব্যর্থ হয়ে। মন্ত্রণাসভা থেকে উঠে আসা কুন্তীও তার আত্মজকে জয় করতে মরিয়া। কারণ, তার প্রতিষ্ঠিত, অপ্রতিষ্ঠিত — উভয় মাতৃত্বই আজ সংকটাপন্ন। কুন্তী যখন

কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করে কবিত্ব দিয়ে, হৃদয়গ্রাহী করে — 'কর্ণ,/আমি তখন অনূঢ়া, তাই লজ্জায়, কলঙ্কের ভয়ে,/ তোমাকে মূল্যবান বসনে ঢেকে; একটি ভাসমান মঙ্গলপাত্রে/গঙ্গার বুকে অর্পণ করেছিলাম।' তখন কর্ণের মন্তব্যে বাজে তীব্র উপহাস — 'আমাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলে।' কুন্তী আবারো ব্যঞ্জনা দিয়ে সাজায় তার সংলাপ — 'কালস্রোতে, কর্ণ আমি তোমাকে কালস্রোতে ভাসিয়াছিলাম'। কর্ণ তার যথাযথ প্রত্যুত্তর করে — 'বেদনা-মনস্তাপ-প্রায়শ্চিত্তঃ সব অর্থহীন এখন।/ কালস্রোত আমাকে অনেক দূরে টেনে এনেছে।' এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, মনস্তাত্ত্বিক দ্বৈরথ, সংবেদনার অন্তরালে সূক্ষ্ম রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র *প্রথম পার্থ* নাটকে সঞ্চার করে তীব্র নাটকীয়তা, একই সাথে আধুনিক জীবনের তীব্র, জটিল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের আস্বাদও অনুভূত হয়। কর্ম ও অর্জনে বিশ্বাসী কর্ণ জন্মসূত্রে প্রাপণীয় সমস্ত উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে যখন নিস্তাপ স্বরে বলে — 'ক্ষমা করবেন।/ আমি কারোরই নই/কাউকে আমি আমার ব'লে ভাবি না।/আমি বিশুদ্ধভাবে আমি।/তাছাড়া আর কিছু নয়।', তখন নিঃসন্দেহে জটিল বিচ্ছিন্ন বিশ্বে আধুনিক ব্যক্তিত্বের প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়ায় কর্ণ। পুরাণের বঞ্চিত কর্ণের সঙ্গে তার ব্যবধান দুস্তর হয়ে ওঠে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের কর্ণের সঙ্গেও তার পার্থক্য সূচিত হয়। *কর্ণকুন্তী সংবাদে* কর্ণের জন্ম পরিচয় উদ্ঘাটনের মুহূর্তে কর্ণ ও কুন্তী দু'জনেই তাদের সঞ্চিত আবেগের মুক্তিতে প্রগল্ভ, দ্রবীভূত, যেন মাতা-পুত্রের এই হৃদয়বেদনা নির্মল — তার সাথে যোগাযোগ নেই কোনো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র কিংবা গূঢ় অভিসন্ধির। রোমান্টিক আবেগে পরস্পরের নিকট উন্মোচিত হওয়াই সেখানে মুখ্য। কর্ণ ও কুন্তী — উভয়ের সংলাপই সেখানে সমভাবে আবেগপ্রবণ—

কর্ণ। অর্জুন জননী কণ্ঠে কেন শুনিলাম
আমার মাতার স্নেহস্বর। মোর নাম
তাঁর মুখে কেন হেন মধুর সংগীতে
উঠিল বাজিয়া — চিত্ত মোর আচম্বিতে
পঞ্চপাণ্ডবের পানে 'ভাই' ব'লে ধায়।
কুন্তী। তবে চলে আয়, বৎস, তবে চলে আয়।
কর্ণ। যাব মাতঃ, চলে যাব, কিছু শুধাব না —
না করি সংশয় কিছু, না করি ভাবনা।
দেবী, তুমি মোর মাতা! তোমার আহবানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে — নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরী, জয়শঙ্খ — মিথ্যা মনে হয়
রণহিংসা, বীরখ্যাতি, জয়পরাজয়।
কোথা যাব, লয়ে চলো। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৫৪৯)

মহাভারতে যা স্বাভাবিক, তাকেই রবীন্দ্রনাথ মানবিক আবেদনে আবেগসঞ্চারী করে রূপদান করেন। কিন্তু, বুদ্ধদেব বসুর নাটকে তা দ্বান্দ্বিক, ট্রাজিক ও রাজনৈতিক আবহে অন্তঃসংঘাতময়। তাই রবীন্দ্রনাথের কর্ণের মতো বুদ্ধদেব বসুর কর্ণ কুন্তীর আহ্বানে সম্মোহিত নয়, বরং সতর্ক; বিশ্বাসী নয়, বরং সন্দিগ্ধ —

কর্ণ

তা'হলে ... এই আপনার অভীষ্ট? পাণ্ডবের শ্রীবৃদ্ধি ?
অর্জুনের আয়ু?
সেই জন্যই এই পরিত্যক্ত পুত্রকে আজ
মাতৃস্নেহে অভিষিক্ত করলেন? (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ৯৫)

যুদ্ধে কর্ণকে অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী জেনে উপযুক্ত সময়ে তার সতৃষ্ণ অন্তরকে প্ররোচিত করতে চায় কুন্তীর সঞ্চিত স্নেহ, কিন্তু কর্ণের নিকট সে সম্মোহন অভ্যর্থনা, আলিঙ্গন তখন সুদূর-পরাহত। ততদিনে তাদের মধ্যকার ব্যবধান দুস্তর।

তাই, *প্রথম পার্থে* কর্ণের সংকল্প ও প্রতিরোধের পথে ভীষণভাবে ব্যর্থ হয় কুন্তীর সমস্ত কৌশল। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক মনস্তত্ত্বে এখানে সক্রিয় হয়ে ওঠে সমকাল ও তার স্বভাব। কারণ, এই হার-জিতের যুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয় আধুনিক মানুষের অস্তিত্ব; পরাজয়ে লুপ্ত হয় তার অস্তিত্ব। জীবন এখানে ক্ষমাহীনভাবে সংঘাতময়, স্নায়বিক টানাপড়েনে দ্বান্দ্বিক, অভিসন্ধির শীতলতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রতি মুহূর্ত, সংবেদনা অপেক্ষা জয়পরাজয় এখানে মুখ্য। তাই, কুন্তীর মাতৃস্নেহের মধ্য থেকে উঁকি দেয় স্বার্থান্বেষী ষড়যন্ত্র, কূটকুশলতা — আর সচেতন ও সর্তক কর্ণ তা প্রতিহত করে তার স্বনির্মিত অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। ফলে, স্বভাবতই যুগধর্মে রবীন্দ্রনাথের *কর্ণকুন্তীসংবাদের* সঙ্গে *প্রথম পার্থের* দূরত্ব সূচিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হিন্দোল ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যাটি প্রশংসনীয় — 'তুলনামূলক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *কর্ণকুন্তীসংবাদ*-এ যা পাইনা, তা আমরা পেয়ে যাই এই নাটকে। দ্রৌপদী, কৃষ্ণের ধূর্ত চরিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়, রাজনৈতিক খেলার বেদনাদায়ক হিংস্র মূর্তিটি আমাদের চোখর সামনে ভেসে ওঠে। বুদ্ধদেব বসু চরিত্রগুলির মনঃসমীক্ষণ করেন প্রায়। ফলে আধুনিক মনোজগতের সাবকনসাসনেসের প্রবল আলোড়ন পাওয়া যায় কর্ণ, কুন্তী, কৃষ্ণ এবং দ্রৌপদী চরিত্রে। এপিকের চরিত্রগুলো নিয়ে কাজ করলেও কোনও চরিত্রই এখানে সম্পূর্ণ সাদা বা সম্পূর্ণ কালো থাকে না, হয়ে থাকে ধূসর, রহস্যময়।' (হিন্দোল, ২০০৮ : ১৬৫) পৌরাণিক চরিত্রগুলোর মধ্যে আধুনিক মানুষের জীবনের দ্বন্দ্ব মানসতা সঞ্চারের যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে বুদ্ধদেব বসু কাব্যনাটক রচনা করেন, তার তুঙ্গস্পর্শী রূপটি লক্ষ করা যায় *প্রথম পার্থে* ।

মহাভারতে উল্লেখ না থাকলেও বুদ্ধদেব বসু তাঁর *প্রথম পার্থ* নাটকে কর্ণের সঙ্গে দ্রৌপদীর কথোপকথনের দৃশ্যটি সংযুক্ত করেন। কারণ, আধুনিক কর্ণের যৌন-জীবনের অবদমনের বেদনা ও সংকটটিকে তিনি জাগিয়ে তুলতে চান নাটকে। কর্ণের উদ্দেশে দ্রৌপদীর বন্ধুত্বের প্রস্তাব, তাদের মধ্যকার পরস্পর ক্ষোভ, প্রতিবাদ, কৈফিয়ত, উদ্দেশ্য সমস্ত কিছুই বুদ্ধদেব বসুর কল্পিত। *মহাভারতের* মনস্বিনী দ্রৌপদীর মধ্যে তিনি সঞ্চার করেন প্রখর, শানিত বাগ্মিতাগুণ। তেজস্বিনী দ্রৌপদীকে তিনি তৈরি করেন রাজনৈতিক বোধসম্পন্ন কূটনৈতিক এক নারীরূপে, যে রাষ্ট্রের কল্যাণ, দ্বন্দ্বের সমাধান এবং সবকিছুর উর্ধ্বে আত্মস্বার্থসিদ্ধির সমস্ত উপায় সম্পর্কে সচেতন, কুশলী। কর্ণকে নমনীয় করার লক্ষ্যে সে প্রীতিবিনিময়ের আহ্বান জানায় প্রথমেই —

দ্রৌপদী

এখানে এই আকাশের তলে, নির্জনতায়
মুহূর্তের জন্য,কয়েক মুহূর্তের জন্য
তুমি ভুলে যাবে আমি তোমার বৈরীপত্নী,
আমি ভুলে যাবো তোমার উপর আমার আক্রোশ;
সম্ভব কি নয়, সম্ভব কি নয়
মুহূর্তের জন্য, কয়েক মুহূর্তের জন্য
তোমার আর আমার মধ্যে প্রীতিবিনিময়? (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১১৭)

কর্ণকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক করে তোলার জন্য দ্রৌপদী ব্যবহার করে চাটুবাক্য — 'কিন্তু হয়তো কিছু আছে, যা বংশ দিয়ে বিচার্য নয়—/ স্বতঃস্ফূর্ত, আকস্মিক কোনো কৌলীণ্য?/ আমি আজ তা-ই দেখছি তোমার মধ্যে।' তাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে কর্ণকে 'দুর্যোধনের যন্ত্র' বলে তার অহমকে উচ্চকিত করতে চায় সে, যুদ্ধে কর্ণের লাভক্ষতি খতিয়ে দেখায় এবং অবশেষে ব্রহ্মাস্ত্র হিসেবে তার উদ্দেশ্যে ছোঁড়ে বন্ধুত্বের প্রস্তাব — যেন কর্ণের অবচেতন মনের কোথাও যদি বিন্দুমাত্র আসক্তি অবশিষ্ট থাকে, তাকে জাগিয়ে তুলে রণস্পৃহা থেকে কর্ণকে নিবৃত্ত করা যায়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে, এ সবই — অর্থাৎ কর্ণের প্রতি দ্রৌপদীর বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ, কুন্তীর স্নেহের আহ্বান সবকিছুই 'ব্যবহারিক সাফল্যের প্রলোভনের হাতছানি' — 'মার্কিনী প্রাগ্‌মাটিজম'।' (সরোজ, ১৯৯৮ : ১২২) কিন্তু, বারবার বঞ্চিত কর্ণ ভালোভাবেই চেনে এই ঔপনিবেশিক চরিত্র; তাই ধরা দেয় না তাদের সহজ প্রলোভনের ফাঁদে। ফলে, বাগ্মিতা দিয়ে, করুণা দিয়ে, তিরস্কার করে, বন্ধুত্বের প্রলোভন দেখিয়ে, ভবিতব্যের কথা বলে ভয় দেখিয়ে কোনোভাবেই কর্ণের ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না দ্রৌপদী। *প্রথম পার্থে* সবচেয়ে নাটকীয় এবং সংবেদনশীল অংশ দ্রৌপদীর সাথে কর্ণের এই সংলাপ-বিনিময়। কর্ণের যৌবনের প্রথম আকাঙ্ক্ষিত নারী, যাকে সে অর্জন করতে চেয়েছিল একান্তভাবে নিজের জন্য — অথচ, অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হয় তা থেকে, সেই দ্রৌপদী-দর্শনে মুহূর্তকালের জন্য কর্ণের অবদমিত প্রেমিক সত্তার মুক্তি নাটকে সৃষ্টি করে অভূতপূর্ব রোমান্টিক আবেদন —

কর্ণ

— যেয়ো না, পাঞ্চালী।
আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করো:
আমি দেখি তোমাকে আরো একবার —
ক্ষমতার সংঘর্ষ থেকে দূরে, ছলনার সন্ধান থেকে দূরে —
তোমার চূর্ণালক কাঁপছে যখন বাতাসে,
তোমার বসনে যখন বৃক্ষছায়া চঞ্চল,
তোমার অধর যখন রৌদ্ররেখায় স্পৃষ্ট —
যুদ্ধের আগে, গঙ্গার তীরে, শান্ত, নীল বনভূমির নির্জনতায়। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১৩০)

আবেগের ওঠানামায়, কবিত্ব ও নাটকীয়তা এখানে একীভূত, অঙ্গাঙ্গী। *প্রথম পার্থ* নাটকে কর্ণের অবরুদ্ধ আত্মরতির এই রূপায়ণ নিঃসন্দেহে মনস্তাত্ত্বিক ও আধুনিক। বুদ্ধদেব বসুর পূর্বে কর্ণের বঞ্চিত হৃদয়ের এই অনালোকিত অংশটি কেউ এমনভাবে প্রত্যক্ষ করেননি।

প্রথম পার্থ নাটকে কর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণের দ্বিরালাপটি নির্মিত গঙ্গাতীরের নির্জন বনভূমিতে, যেখানে পূর্বের দৃশ্যগুলিও অনুষ্ঠিত। এখানে, কৃষ্ণ স্বয়ং কর্ণের নিকট আগত। কিন্তু, *মহাভারতে* সঞ্জয়ের মুখে এ অংশ বিবৃত এবং সে বিবরণ অনুযায়ী 'কৃষ্ণ কর্ণকে তাঁর রথে উঠিয়ে নিয়ে নগর বাইরে গিয়ে তার প্রতি 'মৃদু বা তীক্ষ্ণ সান্ত্বনা বাক্য' উচ্চারণ করেছিলেন।' [কালীপ্রসন্ন, ১৪১৩ : ৯৫৩] বুদ্ধদেব বসু নাটকীয় সংগঠন ও মঞ্চায়নের প্রয়োজনে এই বিষয়টি পরিহার করে কৃষ্ণকে কর্ণের সমীপে নিয়ে আসেন এবং এক্ষেত্রে *মহাভারতের* কালক্ষেপণকে বর্জন করে একটি দিনের পটে তার সম্পূর্ণ নাটকের ঘটনাকে বিন্যস্ত করেন। যুদ্ধের পূর্ব দিন কর্ণের জীবনের নাটকীয় সংকটকে ঘনীভূত করে তোলার লক্ষ্যেই নাট্যকার সচেতনভাবে পরিহার করেন এই পৌরাণিক কালবিলম্ব। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, *মহাভারতে* কর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণের কথোপকথন ঘটে কুন্তীর সাথে তার সাক্ষাতের পূর্বে। কিন্তু, এখানে কৃষ্ণ যেহেতু কর্ণের নিকট শেষ অভ্যাগত, ফলে তার পূর্বে কুন্তী ও দ্রৌপদীর আগমন সম্পর্কে তিনি অবহিত হন কর্ণের নিকট থেকে। কৃষ্ণের নিকটই কর্ণ ব্যক্ত করে তার সংগুপ্ত অন্তরাত্মার আকাঙ্ক্ষার কথা, যা সে সচেতনভাবে দমিত করে রাখে নিজের অহম ও সংকল্পের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে —

কর্ণ

মাঝে-মাঝে এক ভ্রান্তি নামে আমার মনে,
এক সুস্বাদু সম্মোহন,
পতঙ্গের গুঞ্জনের সঙ্গে মিশে,
পল্লবের মর্মরের সঙ্গে মিশে :
তখন মনে হয় আমিও পারতাম —
হয়তো আমিও সুখী হতে পারতাম —
অন্য কোথাও — যুদ্ধ থেকে, রাজনীতি থেকে দূরে। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১৪১)

কর্ণের পর্বত-কঠিন অনমনীয় চেতনার অন্তরালে এই কোমলতর আর্তি, তার আত্মক্ষয়ী পণের অন্তরালে এই জিজীবিষা তাকে করে তোলে মানবিক। বঞ্চনা ও স্বার্থত্যাগের মধ্যবর্তী এই একান্ত নির্জন মর্মানুভূতি নিয়ে কর্ণ হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যময় চরিত্র, ট্রাজিক নায়ক। তার সংবেদনা নিয়ে *মহাভারতের* প্রান্তদেশ ছেড়ে কর্ণ যেন আমাদের সন্নিকট হয়। কিন্তু, কর্ণের সংবেদনার প্রকাশ মৌহূর্তিক। কুন্তীর আবেদন, পাঞ্চালীর প্ররোচনা মুহূর্তের জন্য তার 'গরল পাত্রকে মধুর' করে দিলেও তার সংকল্প থেকে তাকে স্খলিত করতে পারে না। কৃষ্ণের ভাষায় — 'তোমার চরিত্র থেকে স্খলিত হওনি তুমি,/ আছো নিজত্ব নিয়ে অবিকল।' কর্ণের এই চূড়াস্পর্শী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, আমিত্বচেতনা তাকে চালিত করে জীবনত্যাগী মৃত্যুস্পর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণে। এমনকি কৃষ্ণের সৌভ্রাত্রের আহ্বান, ভবিতব্য বর্ণনা কিছুই তাকে যুদ্ধ সংকল্পচ্যুত করে না। কারণ, এ যুদ্ধ তাকে দেবে ব্যক্তিগত তৃপ্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রতিশোধ ও অর্জন — দেবে মৃত্যুর মূল্যে মহত্তর কিংবদন্তি হবার স্বীকৃতি —

কর্ণ

— কৃষ্ণ আমাকে একটি প্রিয় কথা শোনালে তুমি :
সম্ভব নয় অর্জুনের হাতে আমার পরাভব।
আর সেইসঙ্গে
এক আশাতীত সম্মান দিলে আমাকে।
আমার জন্য তুমিও হবে কুচক্রী,
নেপথ্য ছেড়ে নেমে আসবে মঞ্চে,
হবে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী — তুমি! — অর্জুনের প্রচ্ছদে।
আমার জীবনের তুঙ্গতম মুহূর্ত,
আমার সব বাসনার তৃপ্তি,
আমার সব স্বপ্নের সফলতা —
তা আমাকে উপহার দেবে — অর্জুন নয় — তুমি —
তুমি কৃষ্ণ, যাকে কেউ-কেউ বলে নরশ্রেষ্ঠ — বিশ্বম্ভর!
আমি সম্মত, আমি আনন্দিত, আমার পরাজয়ে আমি ধন্য। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১৫৫)

বুদ্ধদেব বসু তাঁর *মহাভারতের কথায়* কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণকে যেভাবে কুচক্রী, কূটকুশলী, সত্যভঙ্গকারী, বক্রস্বভাবীরূপে চিহ্নিত করেছেন, *প্রথম পার্থ* নাটকে প্রাসঙ্গিকভাবে কৃষ্ণ চরিত্রের সেই রূপই প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু, কৃষ্ণের কূটকৌশল ব্যর্থ হয়, কর্ণ অঙ্গীকার করে তার জাগতিক মৃত্যুকে, চিরদিন মানুষের মনে মৃত্যুহীন হয়ে বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষায়।

প্রথম পার্থ নাটকটি আধুনিক জীবন ও প্রতিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যসূত্রে পৌরাণিক আখ্যানের যথাযথ সংস্থানে ও তার অপূর্ব সংশ্লেষণে, চরিত্রের আধুনিকায়ন এবং কালগত ব্যবধানেও তাদের অসম মনস্তত্ত্বের ভারসাম্যসাধনে ও ভাষাগত দূরত্বের অন্বয় সাধনে , নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও ট্র্যাজিক আস্বাদে, সংলাপের ওজস্বিতা ও অন্তর্ময়তার সুসামঞ্জস্যে, মঞ্চকৌশলের অভিনবত্বে একটি অনবদ্য সৃষ্টি।

৪

প্রথম পার্থ নাটকটির সংলাপ গদ্যছন্দে রচিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বদিন, এক অঘ্রান অপরাহ্ন থেকে নাটক আরম্ভ হয়, বৃদ্ধদ্বয়ের সংলাপে। প্রথম বৃদ্ধের সংলাপে দুপুর-অতিক্রান্ত, সদ্য অপরাহ্নের সেই চিত্র বর্ণিত —

প্রথম বৃদ্ধ

আজ সেই দিন, আমরা যার অপেক্ষায় ছিলাম এতকাল:
অঘ্রান মাস, তিথি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী।
দুপুর পেরিয়ে গেলো, সূর্য নামে পশ্চিমে।
ধীরে, সূর্যদেব, ধীরে,
আজ ত্বরা করবেন না,
আজ বিলম্বিত হোক আপনার সান্ধ্যস্নান।
সময় দিন, আমাদের সময় দিন,

আমরা উৎকণ্ঠিত, আমাদের সময় দিন :
কেননা আজ সূর্যাস্তের আগে এক বিশাল
সিদ্ধান্ত নেবেন নেতারা : কুরুকুল ধ্বংস হবে না রক্ষা পাবে,
নারীকণ্ঠে ক্রন্দনরোল উঠবে কিনা,
মাতবে কিনা মহোৎসবে শেয়াল-কুকুর হস্তিনাপুরে —
সেই সিদ্ধান্ত। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ৭৫)

এ নাটকে সময়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সময়বৃদ্ধির সাথে অপরাহ্নের ছায়া দীর্ঘতর হতে হতে নাটকীয়তা ও উৎকণ্ঠা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কুন্তীর সাথে কর্ণের কথোপকথনের পর ক্রমাগ্রসর সময়ের সাথে সাথে সংকটের মীমাংসাহীনতায় শঙ্কা প্রকাশ পায় প্রথম বৃদ্ধের সংলাপে —

প্রথম বৃদ্ধ

ছায়া দীর্ঘতর,
রৌদ্রে লাগে অপরাহ্নের হলুদ
এখনো মীমাংসা হ'লো না। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১০৮)

নাটকে একাধিকবার অগ্রহায়ণ মাসের উল্লেখও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। মঙ্গলমাস অগ্রহায়ণ — সমস্ত প্রকৃতি যখন ফলন্ত, পরিপূর্ণরূপে শোভিত, তখনই সম্ভাব্য যুদ্ধের আশঙ্কায় সবার মনে তৈরি হয় এক শীতল আততি। প্রকৃতির বৈপরীত্যে যুদ্ধের অনতিকালপূর্বের এই সময়টি উত্তেজনাঘন অথচ করুণ। কৃষ্ণের সংলাপে —

কৃষ্ণ

চেয়ে দেখো, কর্ণ, দৃষ্টিপাত করো চারদিকে
মঙ্গলমাস অগ্রহায়ণ,
শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, ঋতু প্রসন্ন
সুখস্পর্শ বায়ু, শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা,
সোনালি ধানে সোনালি রোদ বিস্রান্ত।
বৃক্ষ ফলবান, জল স্বাদু, পশুরা পরিপুষ্ট,
ঘরে-ঘরে নবান্নভোজের আয়োজন।
কিন্তু অগ্নিবাণে দগ্ধ হবে শস্য, ভস্মীভূত হবে গ্রাম,
সর্পবাণে বিষাক্ত হবে বায়ু,
বরুণাস্ত্রে আবিল হবে জল,
ব্রহ্মাস্ত্রে গর্ভের শিশু নিহত হবে।
কর্ণ, এই কি তোমার অভিপ্রেত? (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১৪৪)

ফলে *প্রথম পার্থের* প্রত্যেকটি চরিত্রের সংলাপেই বিস্তৃত হয় এই রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় কিন্তু লক্ষ্য এক : যুদ্ধ। দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপে রাষ্ট্র, 'সৌভ্রাত্র', 'মৈত্রী', 'বৈরিতা', 'দৌত্য', 'সেনাসংগ্রহ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার এবং তার সাথে সংগত অলংকার প্রয়োগে তৈরি হয় যুদ্ধের আবহ —

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

তাদের আশ্রয়ে সুখে আছি আমরা —
অন্তত ছিলাম:
যতদিন না ধার্তরাষ্ট্র আর পাণ্ডবের মধ্যে বিরোধ
একপাল ইঁদুরের মতো ছিন্ন করেছিলো সেই রজ্জু,
সৌভ্রাত্র যার নাম, যা বেঁধে রাখে রাষ্ট্রকে।
...   .
কেমন করে নষ্ট হ'লো মৈত্রী
কেমন করে পুষ্ট হ'লো বৈরিতা
এতদূর পর্যন্ত— যে সম্প্রতি
উভয়পক্ষ সেনাসংগ্রহে ব্যস্ত, আর কৃষ্ণ এসেছেন
দ্বারকার সিন্ধুতট ছেড়ে শান্তির দৌত্য নিয়ে।' (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ৭৬)

কিংবা, কর্ণের প্রতি কৃষ্ণের সংলাপে —

কৃষ্ণ

আর তারপর —
হয়তো মদ্রদেশে হাহাকার, মৎসদেশে দুর্ভিক্ষ,
সুদূর কম্বোজপুরে রাষ্ট্রবিপ্লব,
চেদিরাজ্য যুবকহীন, সিন্ধুরাজ্যে সধবা নেই —
ভারতরাষ্ট্র বিধ্বস্ত। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১৪৫)

প্রথম পার্থের সব চরিত্র এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তারা যেন বেশ ত্রস্ত, ব্যস্ত, উৎকণ্ঠিত ও উদগ্রীব। ফলে, তাদের সংলাপে কবিত্বের অবসর নেই, মীমাংসাই অধিক প্রয়োজন। এ কারণেই হয়তো *প্রথম পার্থ* নাটকের সংলাপে কবিত্বের ব্যঞ্জনা অপেক্ষা নাটকীয় সংঘাতের প্রতিফলন অধিক মাত্রায় লক্ষণীয়, অলংকরণ বা ব্যঞ্জনা সৃষ্টির চেয়ে শব্দের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে ভাষার যে অলংকরণে বুদ্ধদেব বসু সম্পূর্ণ নাটকটিকে অনুরণিত করে তোলেন, তা হলো অনুপ্রাসের অন্তর্লীন ধ্বনি-মাধুর্য। তবে, এই অনুপ্রাস ধ্বনি ঝংকার তোলে না, শব্দ থেকে শব্দান্তরে, বাক্য থেকে বাক্যান্তরে সমস্ত নাটক জুড়ে সৃষ্টি করে ধ্বনির সূক্ষ্ম অন্তর্বয়ন। এর অন্তর্নিহিত গতিময়তা শ্রুতিকে তৃপ্ত করে নিয়ে চলে সামনের দিকে — জাঁকালো কোনো অলংকারে প্রলুব্ধ করে ব্যাহত করে না গতিকে। এক অন্তঃশীল প্রবহমানতায় নাটকে সৃষ্টি করে মসৃণ গতিময়তা — যেমন পাহাড়ি নদী চলার পথে দু'একটি উপলখণ্ডকে অনায়াসে অতিক্রম করে যায় কিংবা কোনো কঠিন প্রতিবন্ধকতায় প্রতিহত হয়ে আরো বেশি বেগবান হয়ে ওঠে, তেমনি এর ভাষা আর তা গদ্যছন্দে, কথ্যশব্দে আরো বেশি গতিশীল। অন্তর্নিহিত আনুপ্রাসিকতা লক্ষ করা যায় *প্রথম পার্থের* সংলাপের প্রায় সর্বত্র। যেমন, কর্ণের সংলাপে —

কর্ণ

তাহলে শুনুন আমার ক্ষুদ্র একটি কাহিনী :
সেদিন রাজপুত্রদেবের অস্ত্রশিক্ষার প্রদর্শনীতে
উপস্থিত ছিলেন নানা দেশের অমাত্য; হস্তিনাপুরের

আবালবৃদ্ধবনিতা।
আমি ছিলাম অন্যতম প্রতিযোগী। কৃপাচার্য আমার
বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন,
আমার উত্তর শুনে হেসে উঠলেন অভিজাতবর্গ।
আমি বেরিয়ে এলাম লক্ষ চোখের তলা দিয়ে,
বিনা পরীক্ষায় পরাস্ত— অবমানিত —
আমি কুন্তীর প্রথম সন্তান !
হয়তো ভীষ্ম তা ভুলে গেছেন, যিনি আমাদের পূজ্য,
হয়তো দ্রোণ তা ভুলে গেছেন, যিনি কুরুপাণ্ডবের গুরু,
কিন্তু— আমি ভুলিনি। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ৯৬)

'ন,' 'ক্ষ', 'শ,' 'প্র', 'প', 'জ', 'ল', 'ভ', 'ন' প্রভৃতি ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে কর্ণের অভিযোগ যেন আরো প্রবল ও মর্মন্তুদ হয়ে ওঠে। কবিমাত্রেই ধ্বনি-আর্বতনে আগ্রহী থাকেন, কিন্তু *প্রথম পার্থে* ধ্বনির এই মেলবন্ধন এত সহজ ও স্বাভাবিক যে, শ্রুতির আবেশে সম্মোহিত হলেও তার অস্তিত্ব আলাদাভাবে টেরও পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সব নাটকেই ধ্বনি নিয়ে কমবেশি খেলা করেন, কিন্তু, *প্রথম পার্থ* তাঁর সেই ধ্বনি-ক্রীড়ার সর্বোচ্চ উৎকর্ষের স্বাক্ষর। এখানে বাক্যমাত্রেই ধ্বনি-স্পন্দিত। যেমন কৃষ্ণের সংলাপে যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার মুগ্ধকর —

কৃষ্ণ

তুমি বুদ্ধিমান —
মন্ত্রণাসভায় যোগ দাও নি। কিছু নেই
মন্ত্রণার মতো ক্লান্তিকর। মত, মতান্তর, বাদ, প্রতিবাদ,
ব্যর্থ বিচার, নিষ্ফল বিশ্লেষণ
ক্ষাত্রধর্ম, ক্ষমাধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ —
এক বিরাট বন্ধ্য কণ্টক বনে —
(ঈষৎ হেসে)
অন্ধের পদচারণা। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১৩৬)

যুক্তবর্ণের পুঞ্জিত প্রয়োগ যেমন মন্ত্রণাসভার কণ্টকাকীর্ণতার ভাব প্রকাশে সহায়ক, তেমনি কৃষ্ণের সংলাপে গাম্ভীর্য সৃষ্টিতে সক্ষম। শুধু ধ্বনি নয়, প্রায়শই কথ্যরীতি এবং কথনভঙ্গিতে অন্তরাবেগকে পরিব্যাপ্ত করতেই শব্দ প্রযুক্ত হয় বারংবার। যেমন, কর্ণের সংলাপে অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক সর্বনামের পুনঃপুন ব্যবহারে তার অবচেতনের ভাষাকে করে তোলে মর্মসঞ্চারী।

কর্ণ

(উন্মনভাবে, স্বগতোক্তির ধরনে)
কবে তা মনে পড়ে না,
কার মুখ থেকে মনে পড়ে না,
কোনো কল্পনার কম্পন হয়তো, কোনো দূরশ্রুত প্রবাদ,

কোনো গহন স্বপ্নে অতর্কিতে যা ভেসে ওঠে,
জন্মান্তরের স্মৃতির মতো অস্পষ্ট
আমি শুনেছিলাম, ভুলেছিলাম, ভেবেছিলাম,
ভুলে যেতে-যেতে ভুলতে পারিনি,
মেনে নিতে-নিতে মানতে পারিনি
রাজকন্যা কুন্তী আমার জন্মদাত্রী,
আমার পিতা সূর্যদেব। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ৮৬-৮৭)

শুধু সর্বনাম নয়, ক্রিয়ার যৌগিকতা, অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়ার সহাবস্থান সৃষ্টিতেও আবেগ সঞ্চারিত হয় সংলাপটিতে। একইভাবে অব্যয়ের পুনরুক্তি ঘটিয়ে কিংবা বিভক্তি যুক্ত করেও সংলাপকে প্রাণস্পর্শী করে তোলেন বুদ্ধদেব বসু। যেমন, দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপ—

দ্বিতীয় বৃদ্ধ
হায়, ক্ষত্র নারীর ভাগ্য
চিরকাল
প্রেমে জন্ম দিয়ে
প্রেমে স্তন্য দিয়ে
প্রেমে যত্নে পরিচর্যায় উৎসর্গিত হ'য়ে —
তারপর সেই পুত্রকেই
স্বেচ্ছায়, সগৌরবে
হত্যাকাণ্ডে অর্পণ, হিংসার যূপে বলিদান। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১০৪)

কিংবা, পাঞ্চালীর উদ্দেশে কর্ণের রুদ্ধ আবেগের সেই রোম্যান্টিক উচ্চারণে —

কর্ণ
ভালো নয়, পাঞ্চালী,
ভালো নয় নতুন করে বেদনা জাগানো,
নতুন করে সেই জ্বালা,
সেই প্রতিকারহীন অবিচার!
দ্রুপদ কন্যা, ফিরে যাও।
তোমার রূপের রশ্মি আমার পক্ষে দুঃসহ,
তোমার ললিত কণ্ঠ আমার পক্ষে উৎপীড়ন। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১২২)

এভাবে সর্বনাম, অব্যয় এমনকি ক্রিয়াবাচক শব্দ কিংবা বিভক্তিযুক্ত শব্দের পুনরাবৃত্তি *প্রথম পার্থের* ভাষা ও সংলাপকে যেমন আধুনিক ও ব্যবহারোপযোগী করে তোলে, তেমনি আবেগ ও কবিত্বসঞ্চারী বৈশিষ্ট্য দান করে। জিজ্ঞাসাসূচক বাক্যের ব্যবহার এখানে সুপ্রচুর এবং প্রশ্নবোধক বাক্য দ্বারা আবেগের প্রবহমানতা যে কত শৈল্পিক হতে পারে তার দৃষ্টান্ত এখানে অগণিত। যেমন কুন্তী ও কর্ণের সংলাপে —

কুন্তী

(ব্যগ্র স্বরে)

তুমি জানতে? তুমি আগেই জানতে? তাহলে দূরে
ছিলে কেন এতদিন?
যদি স্বপ্নে তোমাকে ধরা দিয়েছিলো সত্য, তাহলে
কেন স্বগৃহে ফিরে আসনি?

কর্ণ

আমার স্বগৃহ? তা কোথায়?
(ক্ষণকাল পরে ভিন্ন সুরে)
— কিন্তু কে নয়,
কে নয় সূর্যের সন্তান এই জগতে? (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ৮৭)

উপর্যুক্ত সংলাপ পরম্পরায় জিজ্ঞসাসূচক বাক্য একইসাথে ধারণ করে কুন্তীর আবেগ ও ব্যগ্রতা, কর্ণের উন্মনা আত্মকথন এবং তার দর্শনকে। সংলাপের ক্ষেত্রে প্রশ্নবোধক বাক্যের এই নানামাত্রিকতা বিশেষত দ্বন্দ্ব ও নাটকীয়তা সৃষ্টিতে এর বিস্ময়কর ক্ষমতাকে আবিষ্কার করা যায় বুদ্ধদেব বসুর *প্রথম পার্থে*। যেমন, কুন্তীর প্রতি কর্ণের অভিযোগ

কর্ণ

(আগ্রহের সুরে)

তুমি লজ্জা পেলেনা, নতুন করে লজ্জা পেলেনা
আজ আমার সামনে এসে দাঁড়াতে, আমাকে পুত্র বলে ডাকতে? (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ৯৩)

কথ্যশব্দে জিজ্ঞাসাবোধক বাক্যে কর্ণের সংলাপ দৈনন্দিন মুখের ভাষার সাবলীলতা অর্জন করে। প্রশ্নবোধক বাক্যের এই অপ্রমেয় ক্ষমতা লক্ষ করা যায় এ নাটকে দ্রৌপদীর সংলাপেও —

দ্রৌপদী

এখনো জ্বালা — এতদিন পরেও?
দ্যূতসভায় তোমার প্রতিশোধ কি পূর্ণ হয়নি?

কর্ণ

(আগ্রহের সুরে)

তোমার মনে আছে? তোমার মনে আছে?
দ্যূতসভায় আমি কি বলেছিলাম? কী করেছিলাম? (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১২২)

এ নাটকে কর্ণের নিস্পৃহা এবং তার অনমনীয়তাকে আঘাত করতে বারংবার ব্যবহৃত হয় প্রশ্নবোধক সংলাপ। দ্রৌপদী তার সংলাপে উপর্যুপরি জিজ্ঞাসার বাণ নিক্ষেপ করে — কখনো ধিক্কারে, কখনো ভালোবাসায় জাগ্রত করতে চায় কর্ণকে। যেমন—

দ্রৌপদী

তুমি কি তাহলে মৃত্যু পণ করেছো?
এই সুন্দর পৃথিবীতে, এই রৌদ্রালোকে
তুমি কি বাঁচতে চাও না কর্ণ?
কেউ নেই, যাকে তুমি ভালোবাসো? কিংবা

দ্রৌপদী

(কোমল স্বরে, কূটভাবে)

... তবু তোমার কাছে একটি জিজ্ঞাসা আমার :
ঐ যাকে অবিচার বললে তুমি,
তার দৃষ্টান্ত
শুধু কি আমার স্বয়ংবরসভা?
তুমি দুর্যোধনকে বলো তোমার সুহৃদ। কিন্তু তার কাছে
কী পেয়েছো তুমি? এক মুঠো রাজত্ব?
কিন্তু তোমার ঐ পদবি —
তা কি নয় অন্তঃসারহীন অভিধামাত্র?
ক্ষমতা সব দুর্যোধনের, কর্তৃত্ব সব দুর্যোধনের
তুমি শুধু ব্যবহার্য তার — যন্ত্র যেমন যন্ত্রীর।
বীর তুমি : এই কি তোমার যথাযোগ্য সম্মান? (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১২৪)

লক্ষণীয় যে, দ্রৌপদী তার সংলাপে একবার জিজ্ঞাসাবোধক বাক্য ব্যবহার করে স্বরকে তীব্র, গতিশীল, প্রাত্যহিক করে তোলে, আবার সরল ও ব্যঞ্জনাময় বাক্য ব্যবহার করে সংলাপকে শ্লথ ও কবিত্বমণ্ডিত করে নাটকের গতি ও ভারসাম্যকে বজায় রাখার জন্য।

চরিত্রানুযায়ী সংলাপ-পার্থক্য *প্রথম পার্থে* তেমন প্রত্যক্ষ বা প্রকট নয়। কারণ, প্রত্যেকটি চরিত্রই চারিত্র্যধর্মে অভিজাত, এমনকি দুই অধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণ বৃদ্ধও। সার্বিকভাবেই *প্রথম পার্থে* সংস্কৃত শব্দের সচ্ছলতা বিদ্যমান, লোকজ শব্দ প্রায় দুর্লভ। তবে, *প্রথম পার্থের* অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো রাজনৈতিক আবহে কুশলী ও কার্যকর সংলাপ সৃষ্টি। কুন্তী-দ্রৌপদী-কৃষ্ণের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে এবং সমস্ত প্রলোভনের মুখে কর্ণের আত্মসিদ্ধান্তে অটল থাকার প্রয়োজনে *প্রথম পার্থের* সংলাপ কখনো আক্রমণাত্মক কখনো প্রতি-আক্রমণাত্মক। এখানে প্রতিটি সংলাপ যেন প্রবল ভীষণ বাক্-যুদ্ধের একেকটি ব্রহ্মাস্ত্র বা শক্তিশেল যা প্রতিক্ষেত্রে দুটি চরিত্রের সংকটকে দ্বান্দ্বিক করে তোলে, নাটকীয় সংঘাতকে উত্তুঙ্গ করে তোলে। যেমন কৃষ্ণের সাথে কর্ণের সংলাপের দ্বৈরথ —

কৃষ্ণ

কিন্তু মানুষের মঙ্গলের জন্য, নিখিলের দুঃখলাঘবের জন্য
তুমি কি আজ নম্য হ'তে পারো না?
পারো না তোমার স্বরক্ত শাখায় ফিরে যেতে,
ভুলতে পারো না তোমার আত্মাভিমান?

কর্ণ

আত্মাভিমান ছাড়া আর কী আছে আমার?

কৃষ্ণ

অসংখ্যের দুঃখ বা সুখ : তাও বিবেচ্য নয়?

কর্ণ

আমি প্রার্থনা করি সুখ, আয়ু, শান্তি — অসংখ্যের জন্য

কৃষ্ণ

কিন্তু ইচ্ছুক নও তার সম্পাদনায়?

কর্ণ

আমার যুদ্ধ আমার নিজস্ব — আমার ব্যক্তিগত।

কৃষ্ণ

কার সঙ্গে? কিসের জন্য? কোন আকর্ষণে?

কর্ণ

আমি চাই অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ — আর কিছু নয়।

কৃষ্ণ

এখনো চাও? অর্জুনকে ভাই বলে জেনেও।

কর্ণ

সব হত্যাই ভ্রাতৃহত্যা। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১৪৭)

কৃষ্ণ-কর্ণ সংলাপের এ অংশ বাদী-বিবাদী রীতিতে নির্মিত। কারণ , এ নাটকে যুদ্ধ কোনো বহির্বাস্তবতা নয়; যুদ্ধ এখানে প্রবলভাবে স্নায়বিক। তাই সংলাপে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে; যেন সংলাপেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত। উপর্যুক্ত সংলাপ-পরম্পরায় কৃষ্ণের সংলাপে অনুনয় এবং কর্ণের সংলাপে অস্বীকৃতি আবার নিম্নোক্ত সংলাপ-পরম্পরায় বিপরীত বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত — সেখানে কৃষ্ণের সংলাপ আক্রমণাত্মক, কর্ণের সংলাপে দৌর্বল্য —

কৃষ্ণ

তোমার ছিন্ন শির মিলিয়ে যাবে রশ্মির মতো
ঊর্ধ্বাকাশে, সূর্যমণ্ডলে।

কর্ণ

(হঠাৎ কেঁপে উঠে)

তুমি—এই করবে?

কৃষ্ণ

আমার চোখে পলক পড়বে না।

কর্ণ

তুমি লজ্জা পাবে না
মিথ্যাচারে — প্রতারণায়?

কৃষ্ণ

আমি তোমাকে অগ্রিম জানিয়ে দিলাম —
এর নাম মিথ্যাচার?

কর্ণ

অর্জুন লজ্জা পাবে না
অন্যায় যুদ্ধে জয়ী হতে?

কৃষ্ণ

সব যুদ্ধই অন্যায়।
সব হত্যাই ভ্রাতৃহত্যা। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১৫১-১৫২)

এভাবে সংলাপের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু একদিকে নাটকীয়তা সৃষ্টি করেন, অপরদিকে চরিত্রগুলোর ব্যক্তিত্ব নির্মাণ করেন ।

নাটকীয় সংঘাতময় এসব সংলাপ ব্যতীত *প্রথম পার্থে* লক্ষ করা যায় কিছু আবেগঘন সংলাপ। অর্থালংকারের আধিপত্য এ নাটকে নেই, তবু এর ধ্বনি-প্রাধান্যের মধ্যেও মাঝে মাঝে নিবিড় অর্থদ্যোতক কোনো অলংকার চোখে পড়ে, যা নাটকীয়তার মধ্যে সঞ্চারিত করে আবেগ, ভারসাম্য বজায় রাখে নাটকে। যেমন কুন্তীর সংলাপে পুঞ্জ-উপমার ব্যবহার —

কুন্তী

আমি তাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলাম
যেমন ঘটের মধ্যে হুতাশন,
যেমন মাটির ভাণ্ডে বৈদূর্যমণি,
যেমন গুহার আঁধারে মহাব্যাঘ্রঃ
আমিই তাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলাম
যাতে সে প্রকাশিত হতে পারে
যথাকালে যথাস্থানে,
দুর্জনের বিনাশের জন্য, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য —
এই হস্তিনাপুরে, যার প্রান্ত ছুঁয়ে জাহ্নবী ব'য়ে যায়। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ৮৪)

কিংবা কুন্তীর আহ্বানে সূর্যদেবের আগমন ও তাদের মিলনের চিত্র, রূপ ও গন্ধময় বর্ণনাটিও অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ —

কুন্তী

আমি জপ করলাম সেই মন্ত্র — সূর্যদেবের উদ্দেশে।
রাত কেটে গেলো অস্থির,
আধো ঘুমে, আধো জাগরণে যেন মোহমুগ্ধ।
কখনো ঘরের মধ্যে ঝড় ব'য়ে যায়,
কখনো চমক দেয় বিদ্যুৎ, বিরাট শব্দে বজ্র ডেকে ওঠে,
কখনো ভেসে আসে তীক্ষ্ণ কোনো সুগন্ধ,
কখনো শুনি মর্মভেদী রাগিণী।
আর তারপর যখন দিনের উন্মেষে ভরে উঠছে আকাশ
তখন আদিত্য, পুষণ, দিনমণি,
তরুণ সম্রাটের মতো সূর্যদেব
প্রেরণ করলেন আমার অন্তঃস্থলে তাঁর দৃষ্টি – একটি
কোমলতম রশ্মিরেখা —
অন্তত আমার, তা-ই মনে হ'লো। নামলো গভীর চিন্তা আমার
চেতনায়।
জেগে উঠে বুঝলাম, আমি অন্তঃসত্ত্বা। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ৮৯-৯০)

এখানে কুন্তীর চেতন-অবচেতনের অনুভব — তার মনোজগতের ইমপ্রেশন প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের মধ্য দিয়ে শব্দ-ভাষায় প্রকাশিত। সূর্যের অসহনীয় তেজঃপুঞ্জের সাথে কুন্তীর মিলনের প্রতিবেশ সৃষ্টি হয় ঘরের মধ্যে ঝটিকার প্রবাহ, বজ্রের নির্ঘোষ, বিদ্যুতের চমক, তার সাথে কোনো মর্মভেদী রাগিণীর আলাপন ও তীব্র কোনো সৌগন্ধ্যের সমন্বয়ে — সবকিছু মিলে শব্দ, দৃশ্য, শ্রুতি ও ঘ্রাণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় ব্যক্ত হয় কুন্তীর স্মৃতি-অনুভবের শব্দমালা। আর এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধতার পর আদিত্যের সাথে তার মিলনের চিত্রকল্পটি অসাধারণ। রশ্মি সহযোগে কুন্তীর গর্ভধারণের এই চিত্রটি গ্রিকপুরাণের দেবতা জিউসের স্বর্ণবৃষ্টিরূপে মর্ত্য-নারীর গর্ভ সঞ্চারের কাহিনীর প্রভাব বলে উল্লেখ করেন চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত — 'সূর্যের সহযোগে নারীর সন্তানবতী হবার একাধিক কাহিনী সমগ্র বিশ্বের পুরাণকথা মন্থন করে সঙ্কলন করেছিলেন স্যার জেমস ফ্রেজার তাঁর *দ্য গোলডেন বাও — এ স্টাডি ইন ম্যাজিক রিলিজ্যন* (১৯২৩-১৯৩৭) গ্রন্থে। গ্রিক পুরাণে আছে দেবরাজ জিউস স্বর্ণধারার রূপে রুদ্ধকক্ষে প্রবেশ করে রাজকন্যা ড্যানীর গর্ভসঞ্চার করেছিলেন। ফ্রেজার এই স্বর্ণপ্রবাহকে সোনালি সূর্যকিরণরূপে ব্যাখা করেছেন। সাইবেরিয়ার কিরঘিজদের মধ্যে প্রচলিত এক লোকপুরাণের গল্পও তিনি উদ্ধার করেছেন, যেখানে বর্ণনা রয়েছে কিভাবে সূর্যদেবতার দৃষ্টিপাতেই সন্তানসম্ভাবিতা হন এক রাজদুহিতা। বুদ্ধদেব সম্ভবত এই দু'টি কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন : কুন্তীর শয়নকক্ষে সূর্যরশ্মির অনুপ্রবেশ এবং মার্তণ্ডদেবতার দৃষ্টিক্ষেপের ফলে তার অন্তর্বত্নী হওয়ার যে বর্ণনা এ নাটকে আছে, তার সঙ্গে ফ্রেজারের উল্লিখিত কাহিনী দু'টির ভাবরূপের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়।' (চন্দ্রমল্লী, ২০০১ : ১৯৮-১৯৯)

অনূঢ়া কুন্তীর প্রথম গর্ভধারণের কবিত্বপূর্ণ সংলাপ ছাড়াও *প্রথম পার্থে* বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে তাদের আবেগময় মুহূর্তের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির আলংকারিক বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। যেমন, বস্ত্রহরণের সময় দ্রৌপদীর লেলিহান সৌন্দর্যের বর্ণনায় কর্ণের সুপ্ত রোম্যান্টিক চেতনার শব্দভাষ্য —

কর্ণ

আমারও স্মৃতি অস্পষ্ট। শুধু মনে পড়ে,
হঠাৎ তোমাকে সভাস্থলে দেখতে পেলাম —
চোখে তোমার অশ্রুর বন্যা, চোখে তোমার রোষাগ্নি,
বিস্রস্ত কেশ, বিশৃঙ্খল বসন,
লজ্জায় তুমি উজ্জ্বলতর, অপমানে দেদীপ্যমান,
লেলিহান বহ্নিশিখার মতো সুন্দর,
ঝঞ্ঝাহত তরণীর মতো অশান্ত,
এক আশ্চর্য. অরুন্তুদ উন্মোচন,
এক অবিশ্বাস্য চিত্তমন্থন আবির্ভাব। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১২২-১২৩)

মৃত্যুর মূল্যে মহত্ত্ব অর্জনের কঠিন সিদ্ধান্তে স্থিতধী কর্ণের মহাকাল-সম্পর্কিত দার্শনিক উপলব্ধিটি প্রতীকী চিত্রকল্পাত্মক —

কর্ণ

জানি, আমিও জানি
সব এক অলঙ্ঘ্য সূত্রে গাঁথা হ'য়ে আছে।
আছে এক অদৃশ্য অক্ষয় মহাবট,
যার ডালে-ডালে পক্ক হয়ে ফ'লে ওঠে
অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যে একটিমাত্র ঘটনা,
অসংখ্য কার্যকারণের একটিমাত্র উত্তর।
সেই মহাবৃক্ষের কোনো-একটি শাখায় এবার দুলবে
রক্তিম একটি ফলের মতো আমার মৃত্যু। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১৫৪)

বহমান জীবনের অসংখ্য ঘটনা ও কার্যকারণের মধ্যে মাত্র দু'একটি অক্ষয় হয় প্রাচীন মহাবৃক্ষরূপী মহাকালের শাখায় ঝুলে থাকা দুর্লভ ফলের মতো। কর্ণের মৃত্যুও তেমনি মহান কিংবদন্তি হয়ে বেঁচে রইবে কালের ইতিহাসে — মহাবৃক্ষের রক্তিম একটি ফলের মতো। *প্রথম পার্থ* নাটকে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা কয়েকটি অলংকারের মধ্যে কর্ণের সংলাপের এই সংহত, গূঢ়, প্রতীকী চিত্রকল্পটি যেন বৈদূর্যমণি রত্ন।

প্রথম পার্থ নাটকে সংলাপের ওজস্বিতা বৃদ্ধিতে এবং মাঝে মাঝে দ্যুতি ছড়াতে রূপকের ব্যবহার সহজাতভাবে লক্ষণীয়। যেমন, প্রথম বৃদ্ধের প্রতি কুন্তীর সংলাপে —

কুন্তী

(ঈষৎ তীব্র স্বরে)
আপনি ব্রাহ্মণোচিত বাক্য বলেছেন, কিন্তু পারবেন কি
দুর্যোধনের ঈর্ষানল নিবিয়ে দিতে
যোগবলে বা মন্ত্রবলে?
দুর্মদ সে, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি দেবে না।
তবে কি শান্তিরক্ষার জন্য পঞ্চপাণ্ডবকে
ভিক্ষান্ন খেয়ে বাঁচতে হবে চিরকাল? (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১০২)

উদ্ধৃত সংলাপে 'ঈর্ষানল', 'যোগবল', 'মন্ত্রবল', 'ভিক্ষান্ন' — শব্দগুলি রূপক। এছাড়া কুন্তীর সংলাপ — 'কালস্রোত, কর্ণ আমি তোমাকে কালস্রোতে ভাসিয়েছিলাম — এ 'কালস্রোত' রূপকটি সংলাপের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সমৃদ্ধ করে, সৃষ্টি করে ব্যঞ্জনা। বিশেষণের ব্যবহার কখনো কখনো *প্রথম পার্থ* নাটকের সংলাপকে করে তোলে অন্তঃস্বভাবী। বিশেষত কর্ণের সংলাপে তার অপচয়িত জীবনের আক্ষেপ প্রকাশে বিশেষণের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। দ্রৌপদীর উদ্দেশে কর্ণের সংলাপে —

কর্ণ

(ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে যেন আপন মনে)
নষ্ট আশা,
ব্যর্থ পরিতাপ,
দুর্মর স্মৃতি,
আমার অপহৃত নিষ্পাপ যৌবন —
ভাবিনি সেই তোমাকে আবার চোখে দেখবো। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১১৬)

কিংবা কৃষ্ণের উদ্দেশে কর্ণের সংলাপে —

কর্ণ

শত্রুতা? কে বলে শত্রুতা?
প্রেম, কৃষ্ণ, তীব্রতম প্রেম!
ঘনিষ্ঠতম ভ্রাতৃত্ব, নিবিড়তম মিলন।
ছিন্ন ত্বক
দীর্ণ মাংস
শোণিতস্রাব
স্বেদ, কম্পন, মূর্ছা, যন্ত্রণা, আনন্দ —
হত্যার তুরীয়ানন্দে মিলন।
আমার বন্দী বাসনা মুক্ত,
আমার রুদ্ধ আবেগে তৃপ্ত,
আমার নিভৃত স্বপ্ন সফল —
আর তারপর
সমাপ্তি — শান্তি — নির্বাপণ
হয় অর্জুনের, নয় কর্ণের। (বুদ্ধদেব, ২০০১ : ১৪৯)

কথ্যভাষার সুষম প্রয়োগ, গদ্যছন্দের প্রবহমানতায়, ধ্বনির অন্তর্লীন আনুপ্রাসিকতায়, অলংকরণের পরিমিতিবোধে এবং নাটকীয়তা সৃষ্টির সক্ষমতায় *প্রথম পার্থের* সংলাপ আধুনিক, স্বচ্ছন্দ ও শিল্পিত।

মিথের সার্থকতা যেমন তার পুনঃপুন জায়মানতায়, তেমনি আধুনিক চেতনার যথার্থ বহিরাশ্রয় মিথ। — কোনো আধুনিক শিল্পীই পারেন এই দুই পরিপূরক সত্তাকে পরস্পরিত করতে — নতুন মনস্তত্ত্বে, নতুন আঙ্গিকে। বুদ্ধদেব বসু সেই মেধাবী শিল্পী, যিনি মিথের অব্যর্থ কোনো আখ্যানে আধুনিক মানুষের জঙ্গম মনোবাস্তবতাকে প্রতিস্থাপনে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। *মহাভারতের* উপেক্ষিত কর্ণ চরিত্রকে আশ্রয় করে বিংশ শতাব্দীর বিবিধ প্রতিকূলতায় অবদমিত, অবমানিত অথচ প্রবলভাবে অহমবিদ্ধ, অন্তরাশ্রয়ী এক যুবকের নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব-সংগ্রাম ও অস্তিত্ব-প্রতিষ্ঠার নির্ভীক পরিণামে নির্মিত *প্রথম পার্থ* — স্থান-কালের দূরত্ব অতিক্রম করে যুযুৎসু সমকালে নিয়তির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এক আধুনিক মানুষের আত্মিক উদ্বর্তনের শিল্প — শিল্পীর নান্দনিক সংযম ও নিষ্ঠার এক নির্বিকল্প নির্মাণ।

টীকা

১. 'The modern nostalgic feels that an irreparable break has taken place between the past and the present, in society and in man's soul. The dubious material gains of progress have been made at the price of stupendous spiritual loss. The nostalgic modern sensibility, looking back on the past, is like Othello viewing Desdimona strangled on the bed. He has thrown away all that is precious and valuable in his life in his pursuit of a self-condemned aim. ... The murdered past is reborn as vision more precious than anything the present has to offer.' Stephen Spender, "Hatred and Nostalgia in Death's Dream Kingdom in the Modern", 1965. *The Struggle of the Modern*. Methuen & co Ltd. 11 New Fetter lane, London.

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অমিয় দেব, ২০০৫। 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য', পুনর্মুদ্রণ, 'উত্তরাধিকার', বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, ৩৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৯। 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক', 'বৈদগ্ধ্য', বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, কলকাতা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ, ১৪১৩। *মহাভারত* (বঙ্গানুবাদ), বেনীমাধব শীলস লাইব্রেরি, কলকাতা।

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, ২০০১। *মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু, ১৩৯৭। *মহাভারতের কথা*, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু, ২০০১। *অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ দুটি কাব্যনাটক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪০৬। *রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ*, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৮। 'আধুনিক জীবন ও পুরাণছায়া', *বুদ্ধদেব বসু : মননে অন্বেষণে*, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পুস্তক বিপণী, কলকাতা।

হিন্দোল ভট্টাচার্য, ২০০৮। 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য ও আমার বর্ণপরিচায়সূলভ কিছু ভাবনা', 'অহর্নিশ', বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা, শুভাশিস চক্রবর্তী, কলকাতা

T.S. Eliot, 2000, 'The Possibility of a Poetic Drama', *Seleted Essays*, Doba Publication, New Delhi.